দারিদ্র নিরসন বান্ধব প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ

আলোচ্য কৌশলপত্রে বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশ থেকে ৬-৭ শতাংশ পর্যন্ত উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে MDG -তে ২০১৫ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠির সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা যায়। এই কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো নিম্নরূপঃ

- স্থিতিশীল অর্থনৈতিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো
- বেসরকারি খাতের উন্নয়ন
- সুষ্ঠু ও কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থা (financial systems)
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারকরণ
- পল্লী উন্নয়ন
- উৎপাদন খাতের সম্প্রসারণ
- অবকাঠামো সেবার বিদ্যমান সামর্থ্য (capacity) ও মানের উন্নয়ন

সুশাসনের প্রসার

সরকারের প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র নিরসন কৌশলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা। এ উদ্দেশ্যে সরকার বিচারকার্যে গতিশীলতা আনায়নের জন্য বিচার বিভাগীয় সংস্কার সাধন, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য পুলিশ প্রশাসনে মৌলিক সংস্কার সাধন, সরকারি ক্রয় কার্যে পূর্ণাঙ্গ জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি সম্পদ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

মানব উন্নয়নে বিনিয়োগ

দেশের দারিদ্র নিরসনে মানব সম্পদ উন্নয়নের একটি শক্তিশালী প্রভাব থাকায় সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক সামর্থ্য বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। এ উদ্দেশ্যে সরকার ইতোমধ্যে শিক্ষা বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বড় অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে। এর ফলে শিক্ষার ব্যাপক পরিমাণগত বিস্তার ঘটলেও স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে আছে। বর্তমানে অনুসৃত কৌশলে এ দুটি ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে সার্বিকভাবে মানব উন্নয়নের সকল কার্যক্রমেই সরকার অধিকতর সম্পদ সঞ্চালন ও বরাদ্ধ করবে।

বক্স -১.১ : জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল্‌স (Millennium Development Goals)

জাতি সংঘের ১৮৯টি সদস্য রাষ্ট্রই ২০১৫ সালের মধ্যে নিম্নোক্ত লক্ষ্য অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ:

১. **চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা নির্মূলকরণ**
- লোকসংখ্যার যে অংশ দৈনিক ১ ডলারেরও কম আয়ে জীবন-যাপন করছে তাদের সংখ্যা অর্ধেকে কমিয়ে আনা
- লোকসংখ্যার যে অংশ ক্ষুধা পীড়িত তাদের সংখ্যা অর্ধেকে কমিয়ে আনা

২. **সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন**
- সকল বালক-বালিকার প্রাথমিক শিক্ষার পুর্ণাঙ্গ শিক্ষাকাল সম্পুর্ণ করার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ

৩. **জেন্ডার সমতার প্রসার এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ**
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে জেন্ডার বৈষম্য দুরীকরণ। ২০০৫-এর মধ্যে হলে ভাল হয়। তবে ২০১৫-এর মধ্যে সকল পর্যায়ে

৪. **শিশু মৃত্যু হ্রাসকরণ**
- পাঁচ বছর বয়সের নীচের শিশুদের মৃত্যু হার দুই-তৃতীয়াংশে হ্রাসকরণ

৫. **মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন**
- মাতৃ মৃত্যুর অনুপাত তিন চতুর্থাংশ হ্রাসকরণ

৬. **এইচআইভি/এইডস্‌, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগ প্রতিহতকরণ**
- এইচআইভি/এইডস্‌ -এর বিস্তার রোধ
- ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য বড় ধরণের রোগের বিস্তার রোধ

৭. **টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ**
- দেশের নীতি ও কর্মসুচিতে টেকসই উন্নয়নের ধারণা সমন্বিত করা; পরিবেশগত সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি পুর্বের অবস্থায় আনা
- নিরাপদ পানীয় জলে প্রবেশগম্যতা নেই লোকসংখ্যার এরূপ অংশকে অর্ধেকে কমিয়ে আনা
- অন্তত ১০০ মিলিয়ন বস্তিবাসীর জীবনমানের ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন

৮. **উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা**
- অরো অধিকতর একটি মুক্ত বাণিজ্য এবং আর্থিক ব্যবস্থা তৈরী করা যা হবে বিধি-ভিত্তিক, নির্ভরযোগ্য এবং অবৈষম্যমূলক। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সুশাসন, উন্নয়ন এবং দারিদ্র নিরসনের অঙ্গীকার
- স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিশেষ চাহিদার দিকে নজর দেয়া। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে এসব দেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের ট্যারিফ ও কোটা মুক্ত প্রবেশগম্যতা, অতিরিক্ত ঋণগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোর জন্য সম্প্রসারিত ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা, সরকারি দ্বিপাক্ষিক ঋণ বাতিল এবং দারিদ্র নিরসনে অঙ্গীকারাবদ্ধ দেশগুলোর জন্য আরো উদার উন্নয়ন সহায়তা প্রদান
- ভূবেষ্টিত (landlocated) এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্নয়নশীল দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর বিশেষ চাহিদার দিকে নজর দেয়া
- উন্নয়নশীল দেশসমূহের ঋণ সমস্যা মোকাবেলা
- উন্নয়নশীল দেশসমূহের সহায়তায় যুবকদের জন্য শোভন ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান
- ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিসমূহের সহায়তায় ব্যয় ভার বহন করা যায় এরূপ আবশ্যকীয় ওষুধে প্রবেশগম্যতার সুযোগ প্রদান
- বেসরকারি খাতের সহায়তায় নতুন প্রযুক্তি বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা প্রদান।

সূত্র: United Nations Department of Public Information

নারী উন্নয়ন

দারিদ্রের চাপ অসমানুপাতিক হারে বাংলাদেশের নারী সমাজের উপর পড়ে। এর পেছনে রয়েছে নারীদের অশিক্ষা, অপুষ্টি, নিম্ন ও বৈষম্যমুলক মজুরি এবং অসুস্থতার উচ্চ হার। নারীর ক্ষমতায়ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষার সুযোগ, শ্রম শক্তিতে অংশ গ্রহণ, সম্পত্তির অধিকার, রাজনীতিতে নারীদের অংশ গ্রহণের সুযোগ ও ঋণে প্রবেশগম্যতা নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম পরিমাপক। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথেষ্ট উন্নতি সাধন করলেও এখনও প্রত্যাশিত পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে নারী উন্নয়নের জন্য কৌশলপত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছেঃ

- জেন্ডার বৈষ্যম দূরীকরণে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ
- নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা হ্রাস
- উচ্চ মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস
- নারীর কর্ম সংস্থান এবং অর্থনৈতিক সুযোগ লাভে বিদ্যমান বাধা অপসারণ
- আনুষ্ঠানিকভাবে সমতা নিশ্চিতকরণে নীতি প্রয়োগ
- সকল স্তরে এবং সকল ক্ষেত্রে ইতিবাচক কার্যক্রম গ্রহণে সমর্থন প্রদান
- নারী উন্নয়ন সহায়ক প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি।

দারিদ্র নিরসন কৌশলের আওতায় উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নারীদের অধিকতর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার সক্রিয়ভাবে উপযুক্ত নীতি ও কর্মসূচির প্রসার ঘটাবে।

সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

বিভিন্ন ধরনের আকস্মিক আয় হ্রাসমূলক (income shocks) পরিস্থিতি মোকাবেলার উদ্দেশ্যে দরিদ্রদের জন্য চার প্রস্থ নীতি গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এগুলো দরিদ্রদের সংকট মোকাবেলার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

- প্রথম নীতিমালায় খাদ্য এবং নগদ সহায়তাপুষ্ট কর্মসূচি, পল্লী এলাকায় বয়স্কভাতা, অসহায় মহিলাদের উন্নয়ন এবং প্রথাগত ত্রাণ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্রদের বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এ কর্মসূচিগুলো সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর (disadvantaged) আবহমান দারিদ্র সমস্যা মোকাবেলা করবে।
- দ্বিতীয় নীতিমালার মাধ্যমে নতুন দরিদ্র যেমন ছাঁটাইকৃত কর্মচারীদের সমস্যা লাঘবের চেষ্টা করা হবে।
  তৃতীয় নীতিমালায় সামাজিক হস্তক্ষেপের গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে সামাজিক সংহতি উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হবে।
- চতুর্থ নীতিমালা ঝুঁকি বীমা বিষয়ক যা চার ধরণের বিষয়কে সংযুক্ত করবেঃ (ক) জরুরি অবস্থায় সমস্যা লাঘবের জন্য ঋণ সুবিধা দেয়া; (খ) আকস্মিক আয় হ্রাস পেলে স্বাস্থ্য সমস্যা লাঘবে উন্নতমানের সরকারি স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা; (গ) দরিদ্রদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার সামর্থ্য বৃদ্ধি; (ঘ) সন্ত্রাস এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহীনতা হ্রাস করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া।

আলোচ্য কৌশলপত্রে দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের একটি বিস্তারিত কাঠামো বিবৃত আছে। এ কাঠামোর আওতায় একটি জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কাউন্সিল (National Poverty Reduction Council) গঠন করা হয়েছে যার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে একটি ফোক্যাল পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে যেখানে দারিদ্র নিরসন কর্মসূচির অগ্রগতি সংক্রান্ত সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগৃহীত হবে।

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দ্রারিদ্র নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়নের জাতীয় কৌশল বাস্তবায়নের সুবিধার্থে একটি মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো স্থির করা হয়েছে। ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বাজেট প্রাক্কলনকে 'বেঞ্চমার্ক' ধরে কাঠামোটি প্রণীত। এ কাঠামো প্রণয়নের উদ্দেশ্য হ'ল সামষ্টিক অর্থনীতির মৌল প্রবণতাগুলো চিহ্নিত করে অর্থনীতির মূল গতিধারা সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ এবং তার ভিত্তিতে বস্তুনিষ্ঠ বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

এ কাঠামোতে একটি স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশের কথা বিবেচনা করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হ'ল প্রকৃত জিডিপি'র দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন যা ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের ৫.৫ শতাংশ থেকে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ৬.৫ শতাংশে উন্নীত হবে। মধ্য-মেয়াদে দারিদ্র নিরসনে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে অর্থনীতির গড় প্রবৃদ্ধি ঐতিহাসিক প্রবণতার (৪ শতাংশ) উর্ধ্বে। সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে কাঠামোগত সংস্কারের নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে আশা করা হচ্ছে ২০০২-০৩ অর্থ বছরের প্রবৃদ্ধির গতি পুনরুদ্ধার হবে, যা ২০০৩-০৪ অর্থ বছর থেকে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিকে অগ্রসর হবে।

যেহেতু অর্থনীতিতে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রাস্ফীতির উঠানামা প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে, আয় বন্টন এবং দারিদ্র পরিস্থিতিকে অধিকতর প্রকট করে তোলে সেহেতু এ কাঠামোতে নিম্ন ও স্থিতিশীল মুদ্রাস্ফীতির কথা বিবেচনা করা হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে যাতে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে অর্জিত উৎপাদ দারিদ্র্য নিরসনের ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে মুদ্রাস্ফীতির হার ৪ শতাংশ হবে এবং এরপর তা স্থিতিশীল থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ পূর্বেকার নিম্ন সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ অনুপাতের পরিস্থিতি থেকে ১৯90-এর দশকে মাঝারি ধরণের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ অনুপাতে উত্তরণ লাভ করে। ভবিষ্যতে এ প্রবণতা অব্যাহত থাকবে এবং আগামীতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি পাবে। অধিকন্তু, দারিদ্র্য নিরসন কৌশল বাস্তবায়ন যে ধরণের উচ্চতর প্রবৃদ্ধির প্রয়োজন তা উচ্চতর বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। সরকারি পুঁজির উন্নততর ব্যবস্থাপনা এবং অবকাঠামোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা (যা ব্যক্তি খাতের পুঁজির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করবে) এমনভাবে নিশ্চিত করা হবে যাতে মূলধনের উৎপাদনশীলতা বাড়ে এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়।

দ্রুত দারিদ্র নিরসনের জন্য প্রয়োজন অধিক পরিমাণে সরকারি রাজস্ব। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশের রাজস্ব/জিডিপি অনুপাত এবং কর/জিডিপি অনুপাত এখনও কম। সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের যে পরিকল্পনা রয়েছে তাতে রাজস্ব/জিডিপি অনুপাত ২০০২-০৩ অর্থ বছরের ১০.৬ শতাংশ থেকে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ১১.৯ শতাংশে এবং কর/জিডিপি অনুপাত একই সময়ে ৮.৩ শতাংশ থেকে ৯.৭ শতাংশে উন্নীত হবে। ২০০১-০২ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বাড়ানোর জন্য ইতোমধ্যে সরকার কতিপয় স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বাজেটে অতিরিক্ত কয়েকটি পদক্ষেপ

গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। কর-বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ের উন্নতির জন্য সরকারি পণ্য ও সেবার মূল্যও সরকার যৌক্তিককরণ করছে। রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির জন্য ভবিষ্যতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলে রাজস্ব ব্যবস্থায় আরও সংস্কার আনা প্রয়োজন হবে।

দারিদ্র্যের মাত্রা দ্রুত হ্রাস করার জন্য সরকারি ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো প্রয়োজন। মধ্যমেয়াদি কাঠামোর আওতায়, জিডিপি'র অনুপাতে মোট সরকারি ব্যয় ২০০২-০৩ অর্থ বছরের ১৫.২ শতাংশ থেকে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ১৬.৪ শতাংশে উন্নীত হবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ২০০২-০৩ অর্থ বছরের জিডিপি'র ৫.৮ শতাংশ থেকে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের জিডিপি'র ৬.৯ শতাংশে উন্নীত হবে। এতে অর্থনীতির প্রধান প্রধান খাতগুলোর উন্নয়নের জন্য সঞ্চালিত অতিরিক্ত সম্পদ অধিক হারে ব্যবহার ক্ষমতা সম্প্রসারিত ও উন্নত হবে।

বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৩.৮ থেকে ৪.০ শতাংশের কাছাকাছি (অনুদান বাদে ৪.৫ থেকে ৪.৭ শতাংশ) থাকবে এবং অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক সম্পদ দ্বারা ঘাটতির অর্থায়ন হবে। তবে ঘাটতির অর্থায়নে কম সুদযুক্ত বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভর করতে হবে যাতে অপ্রতুল বাজেট রিসোর্স-এর উপর চাপ না বাড়ে। আশা করা হচ্ছে গৃহীত কর্মকৌশলের আওতায় দারিদ্র্য নিরসন এজেন্ডা অর্থায়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে। ফলে নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদান ব্যতীত) জিডিপি'র অনুপাতে ২০০২-০৩ অর্থ বছরে ১.৬ শতাংশ থেকে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ১.৮ শতাংশে বেড়ে যাবে।

২০০৫-০৬ অর্থ বছরে নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন জিডিপি'র ১.৯ শতাংশ প্রাক্কলিত হয়েছে। মধ্যমেয়াদে মুদ্রা ও ঋণ সংক্রান্ত কর্মসূচি জিডিপি'র উচ্চতর প্রবৃদ্ধি এবং মূল্যস্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ২০০২-০৩ অর্থ বছরের ১২.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ১১.৯ শতাংশে দাঁড়াবে। ফলে মূল্যস্ফীতির উপর চাপ কমবে এবং নীট আন্তর্জাতিক রিজার্ভ বাড়বে।

বক্স ১.২: মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো: মূল নির্দেশকসমূহ

নির্দেশক		সংশোধিত প্রাক্কলন/বেঞ্চমার্ক	প্রক্ষেপণ				
	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৪.৪	৫.২	৫.৫	৬.০	৬.৫	৬.৫	৬.৫
জিডিপি ডিফ্লেটর (শতকরা পরিবর্তন)	২.৭	৪.৮	৪.০	৪.০	৪.০	৪.০	৪.০
মূল্যস্ফীতি (বার্ষিক গড়)	২.৪	৫.২	৪.৫	৪.০	৪.০	৪.০	৪.০
জিডিপি'র শতকরা হারে							
মোট রাজস্ব ও অনুদান	১১.১	১১.৫	১১.৫	১২.১	১২.৬	১২.৯	১৩.০
মোট রাজস্ব	১০.১	১০.৬	১০.৮	১১.৩	১১.৯	১২.২	১২.৩
কর	৭.৭	৮.৩	৮.৭	৯.২	৯.৭	১০.০	১০.১
কর বহির্ভুত	২.৪	২.২	২.১	২.১	২.১	২.২	২.২
অনুদান	১.০	০.৯	০.৭	০.৮	০.৮	০.৭	০.৭
মোট ব্যয়	১৪.৮	১৫.২	১৫.৫	১৬.১	১৬.৪	১৬.৪	১৬.৩
চলতি ব্যয়	৭.৯	৮.৪	৮.৫	৮.৪	৮.৪	৮.৫	৮.৫
যার মধ্যে: সুদ পরিশোধ	১.৮	২.০	২.০	২.০	২.০	২.০	১.৯
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৫.৮	৫.৮	৬.১	৬.৫	৬.৯	৭.০	৭.০
অসাধারণ ব্যয়	০.০	০.৪	০.৩	০.৬	০.৫	০.৩	০.২
অন্যান্য ব্যয় ১/	১.১	০.৬	০.৬	০.৬	০.৬	০.৬	০.৫
সার্বিক ভারসাম্য (অনুদান সহ)	-৩.৭	-৩.৭	-৪.০	-৩.৯	-৩.৮	-৩.৫	-৩.৩
সার্বিক ভারসাম্য (অনুদান ব্যতিত)	-৪.৭	-৪.৬	-৪.৭	-৪.৭	-৪.৫	-৪.২	-৪.০
প্রাথমিক ভারসাম্য	-২.৯	-২.৬	-২.৭	-২.৭	-২.৫	-২.২	-২.০
অর্থায়ন (নিট) ২/	৩.৭	৩.৭	৪.০	৩.৯	৩.৮	৩.৫	৩.৩
অভ্যন্তরিণ	২.৬	২.১	১.৯	১.৯	১.৯	১.৯	১.৯
বৈদেশিক	১.১	১.৬	২.১	২.০	১.৮	১.৬	১.৪
অর্থায়ন (নিট) ৩/	৪.৭	৪.৬	৪.৭	৪.৭	৪.৫	৪.২	৪.০
অভ্যন্তরিণ	২.৬	২.১	১.৯	১.৯	১.৯	১.৯	১.৯
বৈদেশিক	১.১	১.৬	২.১	২.০	১.৮	১.৬	১.৪
অনুদান	১.০	০.৯	০.৭	০.৮	০.৮	০.৭	০.৭
কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ঋণ (জিডিপি'র শতাংশ)	৫১.৫	৫৩.৮	৪৯.০	৪৮.৪	৪৭.৬	৪৬.৫	৪৫.৩
মুদ্রা ও ঋণ (বছর শেষে শতকরা পরিবর্তন)							
অভ্যন্তরিণ ঋণ	১১.৯	১১.২	১১.২	১২.০	১১.৮	১১.৮	১১.৮
ব্যক্তি খাত	১৩.৯	১১.৩	১১.১	১১.৮	১১.৬	১১.৭	১১.৮
ব্যপক মুদ্রা (M_2)	১৩.১	১২.৫	১২.১	১২.৮	১১.৯	১১.৮	১১.৮
মুদ্রার গতি (velocity)	২.৮	২.৭	২.৭	২.৬	২.৬	২.৬	২.৫
বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)-							
রপ্তানি, এফ.ও.বি	৫৯২৯	৬১২৯	৬৬২০	৭২১৭	৭৮৬৯	৮৫৮৭	৯৩৭৬
বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন	-৭.৬	৩.৪	৮.০	৯.০	৯.০	৯.১	৯.২
আমদানি, সি.আই.এফ	-৮৫১৫	-৯০৯৮	-১০২৭৮	-১০৯২৪	-১১৬২৪	-১২২২৮	-১২৮৬৫
বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন	-৯.১	৬.৮	১৩.০	৬.৩	৬.৪	৫.২	৫.২
সরকারি রিজার্ভ	১৫৮২	২০০০	২৫৪৯	২৯৩৭	৩৩১৪	৩৫৮৭	৪০০৪
দ্রব্য ও সেবা সামগ্রি অমদানি (কত মাসের)	১.৯	২.১	২.৮	৩.০	৩.২	৩.৩	৩.৫
মেমোরেন্ডাম আইটেম (বিলিয়ন টাকা)							
চলতি মূল্যে জিডিপি	২৭১৭	২৯৯৬	৩২৮৪	৩৬৩৬	৪০২৩	৪৪৫০	৪৯২০

সূত্রঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'A National Strategy for Economic Growth, Poverty Reduction and Social Development' শীর্ষক দলিল।

টীকা:

১/ অন্যান্য মুলধন নীট ঋণ প্রদান (lending) এবং খাদ্য হিসাব (চেক ফ্লোট এবং অমিল সহ) অন্তর্ভূক্ত।

২/ অনুদানকে 'above the line' আইটেম হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

৩/ অনুদানকে অর্থায়ন ও 'below the line' আইটেম হিসাবে গণ্য করে।

কর্মসূচির মেয়াদকালে লেনদেনের ভারসাম্য পরিস্থিতির উন্নতি হবে। এই প্রক্ষেপণের পূর্বানুমান হ'ল রপ্তানির সুষম বৃদ্ধি এবং ব্যাপক দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি অর্থায়নের জন্য বাড়তি বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ। স্থূল সরকারি রিজার্ভ ২০০২-০৩ অর্থ বছরের ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২.১ মাসের আমদানির সমান) থেকে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ৩.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে (৩.২ মাসের আমদানির সমান) উন্নীত হবে।

অর্থনৈতিক খাত

নিম্নের অনুচ্ছেদগুলোতে অর্থনীতির খাতভিত্তিক পর্যালোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হয়েছেঃ

কৃষি

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতির কৃষির সমন্বিত অবদান ২০০২-০৩ অর্থবছরের জিডিপি'তে প্রায় ২৩.৪৬ ভাগ যা আর্থ-সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০০১-০২ অর্থবছরে খাদ্য শস্যের প্রকৃত উৎপাদন ছিল ২৫৯.২ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০০২-০৩ অর্থবছরের খাদ্য শস্যের উৎপাদন লক্ষমাত্রা ধরা হয়েছে ২৮০.৮ লক্ষ মেট্রিক টন। চলতি অর্থবছরে ২২৩.৫১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্যের চাহিদা প্রাক্কলন করা হয়। এ বছর কৃষি ও মৎস্য খাতে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে যথাক্রমে ৩.৬% ও ২.৩%। কৃষি অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হওয়ায় দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন ছাড়াও বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য নিরাপত্তা, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। কৃষিখাতের উন্নয়নে সেচের পানির সঠিক ব্যবস্থাপনা, সার প্রাপ্যতা সহজলভ্যকরণ, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পশুসম্পদ পরিচালনা করা, দেশে ব্যাপক বনায়ন ও বন সংরক্ষণ, বন সম্পদের ঘাটতিপূরণ, কাঠভিত্তিক শিল্প কারখানার কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, জীব বৈচিত্র্য পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ ও বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রনে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

শিল্প

অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য । জিডিপিতে ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ১৫.৯১% প্রাক্কলিত হয়েছে যার প্রবৃদ্ধির হার ৬.৬২% ধরা হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তার সাথে জড়িত কতিপয় শিল্প ছাড়া সকল শিল্প খাত দেশী ও বিদেশী বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নে উদ্দীপ্ত ও গতিশীল ব্যক্তিখাতের ভূমিকাই হবে প্রধান যা বিনিয়ন্ত্রিত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষম হয়ে গড়ে উঠবে। শিল্পোন্নয়নের দিকভাস (vision) হচ্ছে যে, আগামী এক দশকের মধ্যে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান হবে ২৫% এবং জনশক্তির ২০% বিনিয়োজিত থাকবে এই খাতে। বর্তমানে শিল্প বৃদ্ধি উৎসাহিতকরণের জন্য থ্রাস্ট সেক্টরভুক্ত সকল শিল্পের ক্ষেত্রে সুদের হার রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত ১০-১২.৫০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৯ শতাংশ করা হয়েছে। জাহাজীকরণ ও প্যাকিং ক্রেডিটের সুদের হার ৮-১০ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে। এছাড়া ব্যাংক ঋণের সুদের হার হ্রাসের লক্ষ্যে ব্যাংক রেট ৭ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালে প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড (বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠনের পর থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ পর্যন্ত মোট ৪১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে এই বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া আরও বৃহত্তর উদ্যোগে শুরু হয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ৪৪টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নীট লোকসান (সাময়িক) ১৪৬১.৫৫ কোটি টাকা। এ লোকসান চলতি ২০০২-০৩ অর্থবছরে ১৩৮৭.৬৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে বৈদেশিক বিনিয়োগ ছিল ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০১-০২ অর্থবছরে বিনিয়োগ হল ৩০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য অবশ্য ইতোমধ্যে সরকার বহুবিধ সুবিধার কথা ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ছয়টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল চালু রয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ পর্যন্ত এ ছয়টি অঞ্চলে মোট ১৭৪টি শিল্প চালু ছিল যার মোট বিনিয়োগ ব্যয় ৫৩৬.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বিদ্যুত ও জ্বালানি

অক্টোবর ২০০২ তে বেসরকারি খাতে নির্মিত ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাণিজ্যিকভাবে চালু হওয়ায় বর্তমান বছরে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৪৬৮০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। এর মধ্যে ৩৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপাদিত হচ্ছে। বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি বিনিয়োগের পরিপূরক হিসেবে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য ব্যাপক

উন্নয়ন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎতের ৭৮.৩৮% সরকারি খাতে এবং ২১.২৬% বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৯০.৬৬% গ্যাসভিত্তিক, ৩.৮৮% পানি ভিত্তিক এবং ৫.৪৬% তেল ভিত্তিক। বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখছে। এছাড়া সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থাপনায় পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডেসা), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো), এবং পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) কাজ করছে। বিউবোর সিস্টেম দ্বারা দেশে ৩৩ কিলোভোল্ট, ও ১১ কিলোভোল্টে বিদ্যুৎ বিতরণ করা হয় এবং বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সারাদেশে ২৩০ কিলোভোল্ট ও ১২৩ কিলোভোল্টে সঞ্চালন করা হয়। আমাদের দেশে এ যাবৎ মোট ২২টি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মধ্যে ২০০১-০২ অর্থবছরে প্রকৃত গ্যাস উত্তোলিত হয়েছে ৩৯১.৫৩ বিলিয়ন ঘনফুট। গ্যাস সম্পদের দ্রুত অনুন্ধান ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সারা দেশকে ২৩টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১২টি ব্লকের জন্য উৎপাদন বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গ্যাসের বর্ধিত চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে সরকাররি খাতের পাশাপাশি বেসকারিখাতও এগিয়ে আসছে। পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য যানবাহন সমূহকে সিএনজি'তে রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ঢাকা 'ক্লিন ফুয়েল প্রজেক্ট'-এর আওতায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সিএনজি চালিত অটো রিক্সা এবং পেট্রোল চালিত কার সিএনজিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করর্পোরশন দেশের বিভিন্ন স্থানে জ্বালানী মজুদ ব্যবস্থা উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন করণের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। অধিকতর ক্ষমতা ব্যবহারের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলার কোম্পানীগুলোকে প্রশানিক ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসন দেয়া হচ্ছে।

পরিবহন ও যোগাযোগ

বাংলাদেশের উন্নয়নে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। স্থিরমূল্যে ২০০২-০৩ অর্থবছরে জিডিপি'তে এই খাতের অবদান প্রায় ৯.৭৮% (সাময়িক)। বাংলাদেশ সড়ক, রেল, নৌ ও আকাশ পথ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি সমন্বয়ে পরিবহন ও যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে মাত্র ৪ হাজার কিলোমিটার সড়ক নেটওয়ার্ক বিদ্যমান থাকলেও ১৯৯৮ সালের হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক, ফিডার রোড ও গ্রামীণ রাস্তার সমন্বয়ে প্রায় দুই লক্ষ তেইশ হাজার কিলোমিটারের এক বিস্তীর্ণ সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। এই সুবিশাল পরিবহন সেক্টরের সার্বিক তত্ত্বাবধান, ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি গঠিত হয়েছে। স্বল্পমূল্যের পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বহুবছর লোকসানী প্রতিষ্ঠান হিসেবে থাকলেও বর্তমানে এডিবি'র সহায়তায় একটি সংস্কার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে যার লক্ষ্য হচ্ছে রেলওয়ের ঘাটতি হ্রাস, ওপেন এন্ডেড সাবসিডি বিলুপ্তকরণ, শ্রমিক সুষমকরণ ইত্যাদি। দেশের নৌ-বাণিজ্যে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম ও মংলা সামুদ্রিক বন্দর প্রধান ভূমিকা পালন করে। অবশিষ্ট বহিঃবাণিজ্যের সামান্য অংশ স্থলবন্দরসমূহ এবং আকাশ পথে সম্পাদিত হয়। নৌপথে দক্ষ শিপিং সুবিধা প্রদান ও আন্তর্জাতিক নৌ-বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার নিমিত্তে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ১৩টি জাহাজের একটি মিশ্রবহর গড়ে তুলেছে। এছাড়া বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় মৎস্য শিকারী, বিদেশীগামী এবং বাংলাদেশ বন্দরে আগমনকারী বিদেশী জাহাজের দুর্ঘটনামুক্ত চলাচল নিশ্চিত করা এবং বাংলাদেশী জাহাজের বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষেণের উদ্দেশ্যে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন সরকারি মালিকানাধীন একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণমূলক সার্ভিস হিসেবে উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীণ রুটে পণ্য, যাত্রী ও গাড়ী পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক লেন-দেন বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে ১২টি স্থল বন্দর সৃষ্টি করা হয়েছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স আকাশ পথে চলাচলের জন্য সরকারি মালিকানাধীন একমাত্র সংস্থা। বিশ্বব্যাপী এভিয়েশন বাণিজ্যের মন্দাবস্থার মধ্যেও সীমিত সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিমান তার অপারেশনাল কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার অবদান অনস্বীকার্য। দেশের জনসাধারণের চাহিদার প্রেক্ষিতে গত ১০ বছরে টেলিফোন, এনডব্লিউডি সার্কিট ও বৈদেশিক সার্কিটের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ সরকারের একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এই বিভাগ বিমান, রেল, বাস ও লঞ্চের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে সারা দেশে ডাক পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে। এছাড়া ডাক বিভাগের কিছু কিছু বিশেষ সার্ভিস ও বিদ্যমান রয়েছে, যার মাধ্যমে মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী, ডকুমেন্ট, ইত্যাদি বিদেশ থেকে দেশে এবং দেশের বাইরেও প্রেরণ করা যায়। বর্তমান বিশ্বায়ন ও বাজার

অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অগ্রগতি অর্জন ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার এখাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিয়ে নিয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌল লক্ষ্য হচ্ছে মানব উন্নয়ন। টেকসই ও উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও দক্ষ মানব সম্পদের ভূমিকা অনস্বীকার্য । মানব সম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার সামাজিক খাতসমূহে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে সম্পদ সঞ্চালন করছে। ২০০২-০৩ অর্থবছরে সামাজিক খাতসমূহে বরাদ্দ রয়েছে মোট সরকারি ব্যয়ের ২৪ শতাংশ। শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৯০ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নারী শিক্ষার প্রসারে ছাত্রী উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে। বয়স্ক ও নিরক্ষরদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এসব উদ্যোগের ফলে সাক্ষরতা হার বর্তমানে ৬৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চালু রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার পাশাপাশি জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি কার্যকর ও সুষ্ঠু স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ৫ বৎসর মেয়াদী স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (HPSP) এ বছরের জুন মাসে শেষ হচ্ছে। আগামী জুলাই'০৩ থেকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি (HNPSP)-এর কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। নারী ও শিশুর উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। নারী পুরুষের অসমতা দূরীকরণ ও নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। দেশের যুবসমাজকে উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরে এবং উন্নয়নে যুব শক্তির সার্বিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী বেকার যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা প্রদান, উদ্বুদ্ধকরণ ও অনুদান প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের ভূমিহীন, দুঃস্থ, ভবঘুরে, এতিম, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড অব্যাহত রয়েছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে উত্তরোত্তর মানব সম্পদের উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

দারিদ্র বিমোচন

দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক সমস্যা। বাংলাদেশ সরকারের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়াসের প্রধান লক্ষ্যই দারিদ্র্য বিমোচন। এ কারণে দারিদ্র্য বিমোচনকে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক প্রকাশিত ২০০০ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ (HIES, ২০০০) প্রতিবেদন অনুযায়ী দৈনিক মাথাপিছু ২১২২ কিলোক্য গ্রহণ পরিমাপে জাতীয় পর্যায়ে ১৯৯৮-৯৯ এবং ২০০০ সালে অনপেক্ষ দারিদ্র্য প্রবণতা যথাক্রমে ৪৭.৭৫ শতাংশ এবং ৪৪.৩৩ শতাংশ এবং একই সময়ে জাতীয় পর্যায়ে চরম দারিদ্র্য ১৮০৫ কিলোক্যালরি পরিমাপের যথাক্রমে ২৮.৩৬ শতাংশ এবং ১৯.৯৮ শতাংশ। ১৯৯৫-৯৬ এবং ২০০০ সালে প্রবর্তিত মৌলিক চাহিদার ব্যয় (CBN) পদ্ধতি অনুসারে দারিদ্র্যের প্রবণতা নির্ণীত হয়েছে। এতে নিম্ন ও উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্যের প্রভাব যথাক্রমে ৩৩.৭ শতাংশ এবং ৪৯.৮ শতাংশ। বাংলাদেশ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট -২০০০ অনুযায়ী মানব দারিদ্র্য সূচক ১৯৮১-৮৩ সালে ১৬.৩ এবং ১৯৯৮-২০০০ সালে ৩৪.৮। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি সচিবদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক নীতি-নির্ধারনী ও দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যে বৃক্ষ রোপন, মৎস্য চাষ, ছাগল পালন, প্রাথমিক ও নারী শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, গ্রন্থাগার উন্নয়ন, শিশু অধিকার, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, দুঃস্থদের জন্য আবাসন ইত্যাদি দারিদ্র নিরসন সহায়ক কর্মসূচি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে ৪৪৭.০০ কোটি টাকার আবাসন (দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জুন, ২০০৬ নাগাদ এ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে। দারিদ্র নিরসনে ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা সর্বমহলে স্বীকৃত। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন এবং গ্রামীণ ব্যাংক ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া তফসিলী ব্যাংকসমূহও ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি

এনজিওগুলোও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আশা, ব্রাক, প্রশিকা ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ ইত্যাদি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

বেসরকারিখাত উন্নয়ন

বাজার অর্থনীতিতে বেসরকারিখাত উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল চালিকাশক্তি। বর্তমান সরকার দেশের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমে বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। এ উদ্দেশ্যে সরকার একদিকে যেমন বিনিয়োগ-বান্ধব (investment friendly) পরিবেশ উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে, অন্যদিকে টেকসই উন্নয়নে বেসরকারিখাতকে সম্পৃক্তকরণেরও উদ্যোগ নিয়েছে। বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন, শিল্পনীতি সংস্কার, বিনিয়োগ বোর্ড গঠন, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন গঠন এবং মূলধন বাজারকে শক্তিশালীকরণ সরকারের গৃহীত বহুবিধ উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বেসরকারি উদ্যোগকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ২০০২-০৩ অর্থবছরে বেসরকারিখাতে ২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হওয়ায় মোট প্রাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩৫০০ মেগাওয়াট-এ উন্নীত হয়েছে যা পূর্বে ছিল ২৬৫০ মেগওয়াট। টেলিযোগাযোগখাতেও বেসরকারি কোম্পানিসমূহ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। মার্চ, ২০০৩ পর্যন্ত ৪টি বেসরকারি কোম্পানি মোট ১১ লক্ষ ৭৪ হাজার সেলুলার মোবাইল সংযোগ প্রদান করেছে যা পুর্ববর্তী বছরে ছিল প্রায় ৭ লক্ষ। এছাড়া ২টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ২৫,৩৪৮টি ফিক্সড লাইন স্থাপন করেছে। পরিবহনখাতে গৃহীত নানা উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে বিমান চলাচল নৌ-পরিবহণ ও রেলওয়ে খাতে বেসরকারিখাতে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জিএমজি এয়ারলাইন্স বর্তমানে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বন্দরসমূহে চলাচল করছে। নৌ-পরিবহণের ক্ষেত্রে কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা, ল্যান্ডিং স্টেশন উন্নয়ন ও পরিচালনা প্রবৃদ্ধি কার্যক্রমে বেসরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থলবন্দরকে ব্যক্তিখাতে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বেসরকারিখাতে বর্তমানে ৩৮টি ব্যাংক, ৬০টি বীমা কোম্পানি ও ২৮টি অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলি সুষ্ঠু ও দক্ষ সেবা প্রদানের পাশাপাশি অন্যান্য বিনিয়োগকে সহজ ও প্রতিযোগিতামুলক করে তুলতে সহায়তা করছে। ২০০২ সাল পর্যন্ত বেসরকারিখাতে মোট ২৪৭৩৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতে বর্তমানে ৬৪২টি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক চালু রয়েছে। বেসরকারিখাতে উচ্চশিক্ষা এবং বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হচ্ছে। কৃষিখাতে ব্যক্তি উদ্যোগে ব্যাপক কার্যক্রম চালু রয়েছে। অগভীর নলকূপ বিক্রয়, উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেসরকারিখাত বিশেষ অবদান রাখছে। একইভাবে পাট শিল্প ও বস্ত্র শিল্পখাতেও বেসরকারি উদ্যোগ বিশেষ অবদান রাখছে। বর্তমানে দেশে ১৮২টির অধিক কটন স্পিনিং মিল রয়েছে, যার মধ্যে ১৫৬টিই বেসরকারিখাতে। প্রায় ৩৮০০টি রপ্তানিমুখী তৈরী পোষাক শিল্প রয়েছে যাতে ১.৮ মিলিয়ন কর্মী নিয়োজিত আছে। সরকার গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে মোট বিনিয়োগের ৭১% অবদান রাখছে। জুলাই, ২০০১ হতে ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত সময়ে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধনকৃত মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬৩৫ এবং মোট প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৮,৭৪৬ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে একই সময়ে নিবন্ধনকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৪,২১৭ মিলিয়ন টাকা। বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি একদিকে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং দক্ষতা অর্জনে অবদান রাখবে অন্যদিকে তেমনি অবকাঠামো ও মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরকারের রাজস্ব ব্যয় লাঘবে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়।

বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

২০০১ সালের প্রকট মন্দা কাটিয়ে বিশ্ব অর্থনীতি ২০০২ সালে পুনরুদ্ধারের পথে অগ্রসর হয়। ফলে ২০০২ সালের প্রথম দিকে বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধরণের প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে। কিন্তু পৃথিবী জুড়ে শেয়ার বাজার পতনের অব্যাহত নেতিবাচক প্রভাব, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, নিম্নমুখী বাণিজ্যিক আস্থা এবং তেলের মুল্য বৃদ্ধির কারণে ২০০২ সালের শেষ দিকে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের অগ্রগতি শ্লথ হয়ে আসে। তা সত্ত্বেও বিশ্বের স্থুল উৎপাদন পুর্ববর্তী ২০০১ সালের ২.৩ শতাংশের তুলনায় ২০০২ সালে ৩.০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। যা হোক, প্রবৃদ্ধির এ পুনরুদ্ধারের পেছনে ছিল শিল্পোন্নত দেশেসমুহে অনুসৃত সামঞ্জ্যপুর্ণ মুদ্রা ও রাজস্বনীতি এবং উন্নয়নশীল দেশেগুলোর উন্নত সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং দ্রুত কাঠামোগত সংস্কার সাধন। তবে ইউরো এলাকা এবং জাপান-এ দুটো বৃহৎ অর্থনৈতিক ব্লক তুলনামূলকভাবে দুর্বল থাকায় এ বছর প্রবৃদ্ধি অর্জনের গতি বাধাগ্রস্ত হয়। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অনিশ্চিয়তা এবং ইরাক যুদ্ধের কারণে ২০০৩ সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির সম্ভবনার যে প্রক্ষেপণ করা হয়েছিল তা পুনঃনির্ধারণের

প্রয়োজন দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত World Econoic Outlook -এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০০৩ সালে বিশ্বের স্থূল উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি হওয়ার কথা ৩.৩ শতাংশ। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এপ্রিল, ২০০৩ এ প্রকাশিত প্রক্ষেপণে বিশ্ব স্থূল উৎপাদ ৩.২ শতাংশ হবে বলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে উন্নত দেশগুলোতে প্রবৃদ্ধির হার ১.৯ শতাংশ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রবৃদ্ধির হার ৫.০ শতাংশ দেখানো হয়েছে। আবার উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে উন্নয়শনশীল এশিয়ার প্রবৃদ্ধি ৬.৩ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সংশোধিত প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০০৩ সালে বিশ্ব বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধি হবে ৪.৩ শতাংশ- যা পূর্বের ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ -এর প্রক্ষেপণের তুলনায় ০.৬ শতাংশ কম। তবে ইরাক যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার বাস্তবতা বিশ্ব অর্থনীতিতে যে প্রভাব ফেলবে তার ভিত্তিতে ২০০৩ সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রক্ষেপণ আবারও নতুনভাবে নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দেবে।